এই সময়

* কথাসরিৎ *

হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,/ অগাধ সাগর-জলে, নির্মল আকাশে,/ হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,/ হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—/ চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে/ উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুচ্চার্য

প্রশাসনের সঙ্গে ভোটের সম্পর্ক বিস্তৃত গভীর। তার মুখ্য কারণ এটাই যে যাতে অবাধে এবং সুষ্ঠু ভাবে ভোট কার্যটি পরিচালনা করা যায়। সেই কাজে প্রশাসনের একটি বড়ো ভূমিকা আছে। তর্ক উঠতে পারে, সব সময়ই অবশ্য ঠিক এই ভূমিকার মধ্যে প্রশাসনিক কাজ আটকে থাকে না। বরং দল দলতন্ত্র যখন প্রশাসনকে আচ্ছন্ন করার উপক্রম করে তখন এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে ভোটের কাজেও প্রশাসনের মাধ্যমে দলতন্ত্রের কিছু ছায়া এসে পড়ল। তেমন কাণ্ড কখন দেখা যায় এবং কখন যায় না, সে বিষয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু ভারতের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক অনুশীলন যেহেতু বিভিন্ন দলের মাধ্যমেই হয়ে থাকে, তাই অন্তত তর্কের খাতিরে কবুল করা উচিত এ ধরনের সম্ভাবনা বাস্তবে দেখা যেতে পারে। প্রশ্ন হল, প্রশাসন যে এখানে সম্পূর্ণত নিরপেক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ তেমন একটি পরিস্থিতি দৃশ্যতই সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। ফলে জনৈক দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত মন্ত্রীর সমভিব্যাহারে গিয়ে যদি কোনও দলীয় নেতা ভোটকর্মে প্রশাসনিক প্রভাবকে কাজে লাগানোর কথা বলেন, তখন তাকে নিছক শিশুর চাপল্য বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। প্রশ্ন হল, ভোটকর্মে যে সত্যিই কোনও প্রশাসনিক প্রভাব নেই সে কথা অন্তত জনসমক্ষেও দৃশ্যমান হওয়া জরুরি। গণতন্ত্রের স্বার্থেই জরুরি।

নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত ঠিক কত দূর নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে সে প্রশ্ন এখনও ভবিষ্যতের গভীরে, কিন্তু কোচবিহারের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি যে মন্তব্যটি করেছেন তাতে সেই গণতান্ত্রিক নিরপেক্ষতার উপরে আঘাত লাগার একটি সম্ভাবনা থেকেই যায়। তখন মঞ্চে উপবিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় সঙ্গত কারণেই এই বিষয়টিকে লঘু করে দেখাতে চেয়েছেন। আশা করা চলে এই জাতীয় মন্তব্য করা থেকে তিনি সংশ্লিষ্ট নেতা এবং দলীয় অন্য নেতৃবৃন্দকেও নিবৃত্ত থাকার পরামর্শ দেবেন। ভারতীয় রাজনৈতিক কাঠামোয় দল এবং প্রশাসনের আন্তর্সম্পর্ক বহুবিধ ও জটিল। সেই অন্বয়ের মধ্যে একে অপরকে প্রভাবিত করার একটি সম্ভাবনা থেকেই যায়। সে ক্ষেত্রে দল এবং প্রশাসন উভয়েরই কর্তব্য হল তেমন কোনও সম্ভাবনা যাতে তৈরি না হয় সে ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। কারণ সেই প্রশাসনিক নিরাপত্তা শুধুমাত্র যে নির্বাচন কর্মকেই অর্থপূর্ণ করে তুলবে তা নয়, তার সঙ্গে দলকেও এমন একটি মাত্রা প্রদান করবে যা এই গণতান্ত্রিক কাঠামোয় বাঞ্ছিত। দলতন্ত্র ভোটের সময়কালে প্রশাসনিক কর্তব্যকর্মের ছায়া ফেলেছে, এমন অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে সম্পূর্ণ বিরল বলা চলে না। এই ধরনের অভিযোগ আগেও একাধিক বার উঠেছে। বর্তমানে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তের দু'টি স্থান বদল হয়েছে মাত্র। আসন্ন নির্বাচনের অঙ্গনে তেমন অভিযোগের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সে ব্যাপারে প্রশাসনকে তৎপর হতে হবে। দলেরও সংযত হওয়া দরকার একই সঙ্গে। মাননীয় জননেতাগণ ভোট বিষয়ক মন্তব্য করার সময়, আশা করা চলে, এ ব্যাপারে অবগত থাকবেন যে বৈঠকখানার লঘু বিশ্রম্ভালাপে যে সব কথা উচ্চারণ করা চলে, প্রকাশ্য সভায় সেগুলি এমনকী ঠাট্টার ছলেও অনুচ্চার্য। গণতান্ত্রিক রাজনীতির পতাকাটি উড্ডীন রাখার জন্যই অনুচ্চার্য।

সুগন্ধ

বিলেতে কুইন্স ইউনিভার্সিটি বেলফাস্টের বিজ্ঞানীরা এমন একটি আবিষ্কার করেছেন যাতে মানুষ যত ঘামবে ততই সুগন্ধ ছড়াবে। গবেষণার ক্ষেত্রটি পারফিউম ডেলিভারি সিস্টেম, যার মোদ্দা ব্যাপারটাই হল, সুগন্ধি জলের সংস্পর্শে আসা মাত্র রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। অর্থাৎ যিনি যত বেশি ঘামবেন, গায়ে ছেটানো সুগন্ধি ততই জলে, থুড়ি ঘামে মিশে চারপাশ আমোদিত করে তুলবে। বিলেতে এটিকে যুগান্তকারী সামাজিক ঘটনা মনে করা হবে কি না সেটি বৃথা প্রশ্ন কারণ ওই বরফ ঠান্ডা দেশে মানুষ ঘামে কম, তবে এ দেশের উচ্চবর্গের মানুষের বহু কালের একটি ঘোরতর সমস্যার সমাধান যে হতে চলেছে সে নিয়ে সন্দেহ নেই। নিম্নবর্ণ, নিম্নবর্গের শারীরিক পরিশ্রম করে অন্ন জোটানো মানুষদের বিরুদ্ধে চালান করার মতো না হলেও, একটি গুরুতর অভিযোগ এই যে তাঁদের গায়ের বদ গন্ধ, অতএব, মনে নিদারুণ ভ্রাতৃভাব জাগলেও তাঁদের জড়িয়ে ধরা তো বহু দূরের কথা, এমনকি পাশে বসাও যারপরনাই মুশকিলের। এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত কুইন্স ইউনিভার্সিটির লোকেরাই জানিয়েছেন, পরীক্ষার ফলাফল হাতে কলমে বাজারি পণ্যের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে ছাড়লে কেমন হয় তা জানতে ওঁদের প্রায় সকলেই কম বেশি উদ্‌গ্রীব। তবে তো আর দেরি নেই। তৃতীয় বিশ্বের বাজার ওই গবেষণালব্ধ রাসায়নিক বিক্রিয়া মারফত তৈরি সুগন্ধিতে ছেয়ে গেল বলে। অচিরেই গোটা তৃতীয় বিশ্ব তবে কি নন্দনকাননে রূপান্তরিত হতে চলেছে?

বাজারে বেশ অনেককাল যাবৎ ঘাম না হওয়ার পাউডার বেশ সস্তায় মিলছে। সাধারণ জিনিস নয় তা একেবারেই, এক বার শরীরে বুলোলে, বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য চটচটে, প্যাচপ্যাচে অস্বস্তি থেকে নিশ্চিত মুক্তি। মনে হতেই পারে কুইন্স ইউনিভার্সিটির গবেষকরা ওই পাউডার কোম্পানির সঙ্গে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছেন, এক হাত দেখে নেওয়ার ইচ্ছাতেই, অর্থাৎ বাজার দখলের চিরাচরিত ধনতন্ত্রের কাঠামো ভিতরে যে ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বরাবরই আশকারা দিয়ে আসা হয়েছে, সেটি হয়তো গবেষণার কোনও না কোনও পর্যায়ে তাঁদের মগজেও উদয় হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারটিকে বাজারি পণ্য নিয়ে এত খাটাখাটনি, অর্থ ব্যয়, লোক লস্কর জোগাড় করে দিনের পর দিন একমনে কাজ করে যাওয়া ইত্যাদি থেকে বাদ পুরোপুরি দেওয়া যায় না। কারণ গবেষণা চালানোর খরচ প্রায় পুরোটাই আসে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংগঠন থেকে। তাঁরা নিজেদের পণ্যের বিক্রি কমে এমন জিনিস বাজারে বরদাস্ত করবেনই বা কেন! বিজ্ঞানীরা পেটের টানেই ওই লড়াইয়ে যোগ দেন। মুশকিল বাধে তখনই, যখন অন্য কোনও যুক্তির লড়াইয়ে প্যাঁচ কষে চলা বিজ্ঞানসাধকদের সাফল্যের খতিয়ান পরিচিত জগতের ঘেমে নেয়ে একসা জনতার জীবনে সামান্যতম বদলের গল্প শোনানোর সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলেছে বলে মনে হয়। ঘর্মাক্ত শরীরে যাদের জীবনের বেশির ভাগটাই কাটবে, তাঁদের জীবন সুগন্ধময় করে তোলা ছাড়া আর কোনও গবেষণা কি হচ্ছে না? সে সাফল্যের গল্প কোথায়?

* অসংখ্য *

৪৩৭

(চারশো সাঁইত্রিশ)টি— নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর রয়েছে বিদ্যুৎ তৈরির জন্য গোটা বিশ্বে। ২০১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী।

* দিনকেদিন *

৬ এপ্রিল

১৮৯৬: গ্রিসে এথেন্সে শুরু হয় প্রথম অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান।
১৯১৭: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।
১৯৩১: সুচিত্রা সেন জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৪২: জাপানি বিমান সর্বপ্রথম ভারতে বোমা বর্ষণ করে।

মৌলবাদী হানায় কারও প্রাণ গেলে বোঝা যায়, বিশ্বাসের ভিত্তি ভঙ্গুর হয়েছে

অভিজিৎ রায়ের পরে ওয়াশিকুর রহমান। ধর্মীয় মৌলবাদীদের আক্রমণে মৃত্যুমিছিল বেড়েই চলেছে। এই মৌলবাদের প্রেক্ষিত কী? লিখছেন **মইদুল ইসলাম**। প্রথম পর্ব

(উপরে বাঁ দিক থেকে) অভিজিৎ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, নিহত ওয়াশিকুর রহমান বাবু
(নীচে) অভিজিৎ রায়ের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে প্রতিবাদ মিছিল

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করে ও একুশের শপথ, প্রত্যয় এবং অঙ্গীকারকে মনে রেখে ঢাকায় যে একুশে বইমেলা হয়, তার প্রাঙ্গণেই গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এক যুক্তিবাদী ও মুক্তমনা ব্লগার অভিজিত রায় খুন হন কিছু ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের হাতে। আবার গত ৩০ মার্চ, যুক্তিবাদী ও মুক্তচিন্তার সমর্থক, আর এক জন ব্লগার, ওয়াশিকুর রহমানকে খুন করে আর এক দল ধর্মীয় কট্টরপন্থী।

হত্যার ইতিহাস

এর আগে ২০১৩ সালে আর এক জন ব্লগার, আহমেদ রাজীব হায়দারকেও একই ভাবে খুন করা হয়। রাজীব হায়দারের অপরাধ ছিল যে তিনি শাহবাগ আন্দোলনের সমর্থক এবং তিনি প্রকাশ্যে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের যুদ্ধপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দাবি করেছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন বেশ কিছু ইসলামি মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধাদের খুন করা এবং বহু মানুষকে বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার ও নিপীড়ন করার গুরুতর অভিযোগ আছে। সেই সব মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার জন্যই রাজীব হায়দারকে খুন হতে হয়। অভিজিত রায় ও ওয়াশিকুর রহমানদের বিরুদ্ধেও মৌলবাদীদের ওই একই রকম ক্ষোভ ছিল। কিন্তু অভিজিত ও ওয়াশিকুরদের বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের একটা বাড়তি রাগ ছিল। সেটা হল অভিজিত ও ওয়াশিকুররা নাকি ইসলাম ধর্ম, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও পয়গম্বরকে নিয়ে 'সম্মানহানিকর' মন্তব্য করেছিলেন। এর আগে ২০০৪ সালে, বাংলাদেশের অন্যতম লেখক ও শিক্ষক, হুমায়ুন আজাদকেও একই ভাবে মৌলবাদীরা আক্রমণ করেছিল। তার আগে ১৯৯০-এর দশকে তসলিমা নাসরিনকেও একই অভিযোগে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল যে, ইসলামি মৌলবাদীদের কাউকে যে কোনও কারণেই হোক, খুন জখম করা, বা হুমকি দেওয়ার কে অধিকার দিল? ইসলাম তো শান্তির বার্তা দেয়। কুরানের সুরা আল বাকারার ২৫৬ নম্বর আয়াতে পরিষ্কার বলা আছে যে, 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নয়'। পয়গম্বরের জীবন ও বাণী যা হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে সেখানে তো এমন কয়েকটা উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে তিনি অনেক অপমান ও কটূক্তিকে কিছু ক্ষেত্রে উপেক্ষা করেছেন, তো অন্যান্য ক্ষেত্রে অপমানকারী ও কটূক্তিকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তা হলে এই সব ইসলামি মৌলবাদীরা কেমন মুসলমান যারা কুরান হাদীসের কথা মানে না? এরা কেমন ধর্মপ্রাণ মানুষ, যারা অন্য মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে খুন করতে উদ্যত হয়?

সৃষ্টিশীল ও যুক্তিবাদী মানুষদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মৌলবাদীদের এহেন আক্রমণ কিন্তু ভারতেও হয়। হিন্দুত্ববাদীদের হুমকির জেরে মকবুল ফিদা হুসেনকে শেষ জীবনে নিজের দেশ ছেড়ে পরদেশে নির্বাসনে থাকতে হয়। হুসেন একটা সময় ইসলামি মৌলবাদীদেরও হুমকির শিকার হয়েছিলেন। ২০০৭ সালে হিন্দু ও খ্রিস্টান মৌলবাদীরা আবার বরোদায় এক কলা বিভাগের ছাত্র, সুলামাস্থুলা চন্দ্রমোহনের আঁকা ছবির বিরুদ্ধে তোপ দাগে। কালা জাদু নামক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ২০১৩ সালের অগস্ট মাসে নরেন্দ্র দাভোলকারকে পুনেতে খুন হতে হয়। হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে চড়া সুরে বক্তব্য রাখার জন্য কি গোবিন্দ পানসারেকে গত ফেব্রুয়ারি মাসে কোলহাপুরে খুন হতে হল? এক সর্বভারতীয় সংবাদপত্র যাদের তদন্তমূলক সাংবাদিকতার ঐতিহ্য আছে, তাদের একটি প্রতিবেদনে পানসারের মৃত্যুর পিছনে যে হিন্দুত্ববাদীদের একটা সম্ভাব্য যোগ থাকতে পারে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। ১৯৮৯ সালের পয়লা জানুয়ারি সফদর হাশমিকেও তাঁর প্রতিবাদী নাটক ও প্রগতিশীল রাজনীতির জন্য দিল্লিতে তৎকালীন শাসক দলের গুন্ডাবাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

ধর্ম বা কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শকে নিন্দা করার জন্য বা সেই সম্পর্কে কটু কথা বলার জন্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মৌলবাদীদের হাতে যদি কাউকে খুন হতে হয় অথবা কেউ আশঙ্কাজনক ভাবে আক্রান্ত হন তা হলে তার মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মৌলবাদীদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অপরিণত, ভঙ্গুর, এবং অসুরক্ষিত ভাবাবেগই প্রকাশ পায়। এহেন কাণ্ডের জন্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মৌলবাদীরা কিন্তু কোনও দুর্দমনীয় সাহসের পরিচয় দেয় না। বরং তাদের দুর্বলতা, নৈরাশ্য এবং মতাদর্শগত প্রচারের বিফলতা আরও বেশি করে প্রকট হয়। কেউ যদি সত্যি কোনও একটি বিশ্বাসে (ধর্মীয় বা রাজনৈতিক) বিশ্বাসী হন তা হলে অন্য যে কেউ তাঁর বিশ্বাস নিয়ে যতই গালমন্দ করুক না কেন তাতে বিশ্বাসী মানুষের কিছু যায় আসার তো কোনও কারণ নেই। এক জন বিশ্বাসী মানুষ তার নিজের বিশ্বাসে যদি অটুট থাকেন তা হলে তাঁর (রাজনৈতিক বা ধর্মীয়) বিশ্বাস নিয়ে কে কী বলল তাতে তাঁর কী যায় আসে?

পরাজয়ের হিংসা

এখন প্রশ্ন হল ইসলামি মৌলবাদীরা কেনই বা ধর্মের নামে কটূক্তি সহ্য করতে পারে না? তারা যদি 'মহাপ্রলয়ের' পরে শেষ বিচারের দিন (কেয়ামত), যে দিন পাপ পুণ্যের হিসেব হবে তা বিশ্বাস করে তা হলে তো তারা পৃথিবীতে ধর্মের নামে কুৎসাকারী পাপীর শাস্তির ভার, ঈশ্বর বা আল্লাহর উপর ছাড়তে পারে। নিজেদেরকে আল্লাহর স্বঘোষিত সেনানী হিসেবে জাহির করে আইন কানুন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার কী প্রয়োজন? আসলে যুক্তিবাদী ও মুক্তচিন্তার প্রতি ইসলামি মৌলবাদীদের হিংসাত্মক আক্রমণ আজকের পৃথিবীতেই সম্ভব যেখানে মৌলবাদীদের অস্তিত্বকে আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক জীবনযাত্রা এবং প্রশ্নগুলো চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। ইসলামি মৌলবাদের এই আক্রমণাত্মক রূপ তাই মধ্যযুগে খুব একটা পাওয়া যেত না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, অষ্টম আর একাদশ শতাব্দীর মাঝে চার জন বরেণ্য মুসলিম দার্শনিক: আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন জাকারিয়া আল-রাজি, ইব্‌ন আল-রাওয়ান্ডি, আবুল আলা আল-মারি এবং আবু ইসা আল-ওয়ারাকদের অনেক বক্তব্য ও তাঁদের সঙ্গে মুতাজিলা দর্শনিক চিন্তা শুনলে আজকের মৌলবাদীরা কানে হাত তো দেবেনই, দু'চারটে ছোটোখাটো যুদ্ধ বাধিয়ে দিতেও পিছপা হতেন না। এদের সঙ্গে যদি বেশ কিছু সুফি চিন্তাভাবনাকে যোগ করা যায় তা হলে আজকের মৌলবাদীরা এদের প্রত্যেককে ঈশ্বরনিন্দুক ছাড়া আর কিছুই বলবে না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে ওই সব বরেণ্য দার্শনিক ও সুফিবর্গকে কতল করা হয়নি। মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্ব তখন প্রথম বিশ্ব আর ধারে ভারে ইউরোপের হাল তখন খানিকটা দ্বিতীয় বিশ্বের মতো। ইউরোপ তখন গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। জোয়ান অফ আর্ক-কে 'হেরেসি' বা প্রচলিত খ্রিস্টান ধর্মমতের বিরুদ্ধচারণের জন্য পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে ক্যাথলিক চার্চ নিন্দা করছে আর ভারতে সতীদাহ প্রথা তখন সমাজে ভীষণ ভাবে বিদ্যমান। মুসলিম বিশ্ব তখন ক্ষমতাসীন থাকার সুবাদে ধর্মের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী মানুষ ও নিন্দুকের তীব্র বক্তব্যকে অনেক সময় উপেক্ষা করতে পারত। ঠিক যেমন, আলেকজান্ডার ডায়োজিনিসের অবজ্ঞাসুলভ আচরণকে উপেক্ষিত করেছিলেন। ঠিক যেমন, পৃথিবীর যে কোনও রাষ্ট্রনায়ক বা শাসক, নিত্য দিন প্রচুর মানুষের গালিগালাজ খেয়ে নিন্দুকদের মারতে বা জেলে পুরতে উদ্যত হন না। মৌলবাদীদের মতো 'ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে' বলে পাল্টা যুক্তি-তর্ক না দিয়ে দুমদাম মানুষ খুন করে না। মৌলবাদীদের হিংসাত্মক আক্রমণ তাই তাদের আধুনিক পশ্চিমি ভাবধারা ও জীবনযাপনের কাছে হেরে যাওয়ার যন্ত্রণা ও পিছিয়ে পড়ার পীড়া থেকে উদ্ভূত। গত তিন শতকে মুসলিম দুনিয়া পশ্চিমি উপনিবেশিকতার কাছে হারছে। সেই পরাজয়কে মৌলবাদীরা মন থেকে মেনে নিতে না পেরে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণায় ধর্মীয় পরিচয়, প্রথা, পরম্পরা ইত্যাদি আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে। এবং সেখানে ইসলামি সভ্যতার অনেক গৌরবময় ঐতিহ্যকে সরিয়ে রেখে তারা গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতায় মজে থাকতে চাইছে। মধ্যযুগে ইসলাম বিরোধী কথা বলার জন্য মনসুর হাল্লাজের ফাঁসি ছাড়া আর খুব একটা বড়ো উদাহরণ নেই যেখানে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ বা নিন্দা করে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার মৃত্যু

বিংশ শতাব্দীর মাঝে (১৯৫০ থেকে ১৯৭০-এর দশকে) মুসলিম বিশ্বে অনেকগুলো ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি বিরাজ করছিল। সেই সব ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ধারা কিছু ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল তো অন্যান্য ক্ষেত্রে তা সমাজবাদী এবং কমিউনিস্ট। সৌদি আরব উপদ্বীপকে বাদ দিলে ওই সময়কালে, মুসলিম দুনিয়ার বেশির ভাগ অংশ ইউরোপিয় আলোক-সম্পাতের বিপ্লবী ধারার অভিপ্রকাশ যথা ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব এবং তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাতীয়তাবাদী ও জনমোহিনী রাজনীতিকে সামনে রেখে এক দিকে যেমন গামাল আবদেল নাসের মিশরে শাসন করেছেন, টিউনিসিয়ায় রাষ্ট্রপতি হাবিব বুর্গিবা নেতৃত্ব দিয়েছেন, আলজেরিয়াতে উপনিবেশবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তিকামী ফ্রন্ট লড়েছে। ২০১২ সালের নির্বাচনেও আলজেরিয়াতে জাতীয় মুক্তিকামী ফ্রন্ট সংসদে সবথেকে বড়ো রাজনৈতিক দল। আবার অন্য দিকে বাথ পার্টি ইরাক ও সিরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রণয়নের চেষ্টা করেছিল এবং আফগানিস্তান ও দক্ষিণ ইয়েমেনে কমিউনিস্ট দল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পেরেছিল। ওই সব আধুনিক রাজনৈতিক কার্যক্রমের পূর্বসূরী ছিলেন ১৯২০ ও ১৯৩০ দশকে তুরস্কে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব। মিশরে নাসেরের আগে মহম্মদ আলি ও খেদিভে ইসমাইল বা ইরানের শাহ (রাজা) যে 'আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্রের' আড়ালে আধুনিক আর্থ-সামাজিক প্রকল্পগুলো রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিল, ১৯৫০-এর দশক থেকে মুসলিম দুনিয়ায় বিভিন্ন প্রগতিশীল সরকার সেই আধুনিকীকরণের রাস্তা আরো ত্বরান্বিত করেছিল। পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টোর নেতৃত্বে পাকিস্তান পিপল'স পার্টি এবং বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ বেশ কিছু জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল। উপরে উল্লিখিত শাসকরা অনেকেই পরবর্তীকালে কর্তৃত্ববাদী হয়েছিলেন। ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। কিন্তু তাদের ধর্মনিরপেক্ষতা প্রশ্নাতীত ছিল।

মুসলিম দুনিয়ায় কখনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, গণতন্ত্র বিরোধী সামরিক ও ইসলামি শক্তিগুলোকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করে মুসলিম দুনিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকে দুর্বল করেছে। পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের একটা বড়ো ভূমিকা আছে মুসলিম দুনিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে দুর্বল করে ইসলামি রাজনীতিকে তোল্লাই দেওয়ার পিছনে। ঠিক যেমন ঘটেছিল ১৯২০-র দশকে মিশরে, 'মুসলিম ভ্রাতৃত্ব' নামের মৌলবাদী সংগঠনটি ব্রিটিশ উপনিবেশ শক্তি ও মিশরের রাজপরিবারের মদতে তৈরি হয়েছিল, ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 'ওয়াফদ' পার্টিকে রুখতে। ১৯৫৩ সালে ইরানে সিআইএ-এর মদতে মোস্‌সাদেঘের মতো এক জন প্রগতিশীল ব্যক্তি ও গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা পুতুল সরকারকে বসানো হয়। ইন্দোনেশিয়াতে এককালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিনের বাইরে সবথেকে বড়ো কমিউনিস্ট পার্টি ছিল। ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি সুকার্নোর নাসাকম মিত্রশক্তির সঙ্গে কমিউনিস্টরা ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়েছিল।

১৯৬৫-১৯৬৬ সালে সিআইএ-এর মদতপুষ্ট সুহার্তোর নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং অন্তত পাঁচ লক্ষ কমিউনিস্টকে খুন করা হয়। পৃথিবীর সব থেকে বড়ো মুসলিম দেশে তৃতীয় বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টিকে সামরিক শক্তির সাহায্যে খতম করে দেওয়া হয়। ১৯৬০-এর দশকে সুদানের কমিউনিস্ট পার্টি আফ্রিকার সব থেকে বড়ো কমিউনিস্ট পার্টি ছিল। ১৯৬৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশীর্বাদধন্য গাফার নিমেইরির সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং ১৯৭১-এর মধ্যে কমিউনিস্ট নেতা আবদেল খালিক মাহজুব সহ সুদানের কমিউনিস্টদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়। আফগানিস্তানে রাজতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা সাউর বিপ্লব করেছিল। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে ইজরাইলি সরকার এক সময়ে 'হামাস' নামক ইসলামী মৌলবাদী সংগঠনকে মদত দেয় ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী 'পালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন' (পিএলও)-কে দুর্বল করতে। পাকিস্তানে জিয়া-উল-হক ও বাংলাদেশে জিয়াউর রহমানের সামরিক অভ্যুত্থানের পিছনে মার্কিন প্রশাসনের পূর্ণ সমর্থন ছিল। এ কথা এখন সর্বজনবিদিত যে সোভিয়েত ও আফগান সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে ১৯৮০-র দশক জুড়ে আমেরিকার সিআইএ, সৌদি আরব, ইংল্যান্ড এবং পাকিস্তান ওসামা বিন লাদেন-সহ ইসলামি মুজাহিদিনদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছিল। (চলবে)

> নিজেদেরকে আল্লাহর স্বঘোষিত সেনানী হিসেবে জাহির করে আইন কানুন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার কী প্রয়োজন? আসলে যুক্তিবাদী ও মুক্তচিন্তার প্রতি ইসলামি মৌলবাদীদের হিংসাত্মক আক্রমণ আজকের পৃথিবীতেই সম্ভব যেখানে মৌলবাদীদের অস্তিত্বকে আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক জীবনযাত্রা এবং প্রশ্নগুলো চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

* প্রতি সম্পাদক *

চাওয়া পাওয়া

খাল সংস্কার হোক

পূর্বতন শিবপুর বিই কলেজ এবং আই আই ই এস টি-এর সংলগ্ন অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত স্বর্ণময়ী খালটির আশু সংস্কার প্রয়োজন। দৈনন্দিন বর্জ্য পরিষ্কার তো দূরের কথা, বর্তমানে খালটির জল আর দেখা যায় না, শুধুমাত্রই দুর্গন্ধময় আবর্জনাই দৃশ্যমান। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজ্য সরকারের খাদ্য-দপ্তরের একটি গোডাউনের পাশে উন্মুক্ত প্রস্রাবাগারে দুর্গন্ধ। সব মিলিয়ে, ওই এলাকার গোডাউন গেট অঞ্চলের বাসিন্দাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এখনই খালটির সংস্কার এবং সিমেন্টের স্ল্যাব বসিয়ে ঢাকা দেওয়ার কাজ না করলে, আসন্ন বর্ষায় আমাদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছবে। একই সঙ্গে প্রস্রাবাগারটিরও এই স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি সংশ্লিষ্ট হাওড়া পুরসভার কাছে।

শুভ্রা চক্রবর্তী, বি গার্ডেন, হাওড়া ৭১১১০৩

উড়ালপুলের নীচে সুন্দর্যায়ন হোক

জবরদখল পার্কস্ট্রিটে উড়ালপুলের নীচে যৌন্দর্যায়ন হচ্ছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত— নিউ মার্কেট থানার তরফে পুরসভার বস্তি বিভাগকে প্রস্তাব দেওয়া হয় ওই অংশের সৌন্দর্যায়নের। আমার প্রশ্ন, নিউ মার্কেট থানা যদি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসে সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে তা হলে অন্যান্য থানা (যাদের অধীনে শহরের অন্যান্য উড়ালপুলগুলো আছে এবং জবরদখলীকৃত) কেন এগিয়ে আসবে না? গড়িয়াহাট, তারাতলা, বড়োবাজার এলাকার উড়ালপুলের নীচের অবস্থা বস্তুত দৃশ্যদূষণ! শহরের আশেপাশে যতগুলো উড়ালপুল রয়েছে তার নীচের অবৈধ দখলদারদের সরানো এবং সৌন্দর্যায়ন জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

চন্দন দাশ, রাসবিহারী, কলকাতা ২৬

স্থায়ী